ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও বঙ্কিমচন্দ্র

অশোক চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের প্রথিতযশা বা প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে স্বমহিমায় বিরাজ করছিলেন। ১৮৫৭-র পরবর্তীতে নীল আন্দোলনের (১৮৬০) সূত্র ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাবাহিকতার বিপরীতে যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উজ্জীবিত ধারাটি গড়ে উঠতে থাকে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে, তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলাভ অবধারিত ছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জনৈক ইতিহাসকার তো অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমকে এই 'কংগ্রেসের জনক' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে সেই ইতিহাসকার লিখেছেন যে এদেশের সিভিলিয়ানদের মধ্যে ফ্যুলিআম ওয়েডারবার্ন, স্যর হেনরি কটন ও অক্টেভিয়ান হিউম সর্বদাই তাঁদের স্বার্থ ও ভারতের স্বার্থকে অভিন্ন বলে মনে করতেন! এদেশের হিতার্থেই অক্টেভিয়ান হিউম লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদ পর্যন্ত নাকি প্রত্যাখান করেছিলেন! এই ইতিহাসকার জানিয়েছেন যে অক্টেভিয়ান হিউম —

> বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণ পুনরায় কোন আন্দোলনের চক্রে আকৃষ্ট হইয়া আবার সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় জাতির অমঙ্গলজনক কোন আন্দোলন বা বিদ্রোহরূপ ব্যাপারে জড়িত হইতে পারে। তাই তাহাদিগকে সুসংগত আলোচনার গণ্ডির মধ্যে রাখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা গভর্নমেন্টের পক্ষে খুবই হিতকর ও সুবিধাজনক কার্য্য হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (ডিসেম্বর ২৮, ১৮৮৫) সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি। তিনি তাঁর ভাষণে, প্রসঙ্গত বলেছিলেন যে, এই অধিবেশনের আলোচনার দরুন একদিকে যেমন এদেশের জনসাধারণ উপকৃত হবেন, তেমনই দেশের সরকারেরও (বিদেশি ব্রিটিশ সরকার) মঙ্গলসাধন হবে।[২] অর্থাৎ উমেশচন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী এই জাতীয় কংগ্রেস একই সঙ্গে বিদেশি ও পরাধীন দেশের নিগড়াবদ্ধ জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হবে! আর অধিবেশন তিনদিন চলার পর শেষ হওয়ার মুখে অক্টেভিয়ান হিউমকে অভিনন্দন জানাতে বলা হয়েছিল : জাতীয় কংগ্রেসের জনক হিউম-কে আন্তরিক অভিনন্দন। আর এর প্রত্যুত্তরে হিউম বলেছিলেন : এদেশের মহারানিকে অভিনন্দন।[৩] বিষয়টি লক্ষণীয়।

সিভিলিয়ান অক্টেভিয়ান হিউম ছিলেন ১৮৮২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের (ব্রিটিশ সরকার) কৃষিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এই সরকারি দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই তিনি ভারতের

জাতীয় কংগ্রেস গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যথেষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন হিউম সমসময়ের এদেশীয় জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ, সশস্ত্র বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা, নীল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা, এই আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাবলি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এক জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নীল আন্দোলনের ধারা থেকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে চিন্তাভাবনা একটা মাত্রা পেতে শুরু করেছিল, কার্যত তাকে 'ইংরেজ শাসনের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন' হিউম।[৪] ১৮৮৫ সালের গোড়ায় সিমলায় গিয়ে হিউম তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ও তাঁর অনুমোদনসাপেক্ষে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের 'রক্ষাকবচ' হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই কংগ্রেস গঠনের নয় বছরের মাথায় হিউম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশ ত্যাগ করে লণ্ডনে চলে যান। সেখান থেকেই নাকি তিনি কংগ্রেসের কাজকর্মের প্রতি তাঁর সহানুভূতির নিদর্শন রাখতেন।

এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বছরে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন। এই বছরই (১৮৮৫) তিনি প্রকাশ করেন 'ঈশ্বরগুপ্তের জীবন চরিত'। এ সময়ে তিনি সরকারি চাকরিতে দায়িত্বশীল পদে বহাল। তাঁর অবসরগ্রহণের তখনও ছয় (৬) বছর বাকি।

এই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার কথা বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালভাবে জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনোরকম উৎসাহ তিনি কখনও দেখাননি। অথচ এদেশে ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কংগ্রেস গঠনের ব্যাপারে উৎসাহী হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে নানা দিক থেকে গ্রহণীয় প্রতিপন্ন করার অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ইংরেজ ভারতের পরম উপকারী, এবং এই উপকারের ঋণ ভারতের পক্ষে শোধ করা অসম্ভব।[৫] ওয়ারেন হেস্টিংসকে অত্যাচারী হিসেবে দেখানো হলেও আসলে তিনি ছিলেন দয়ালু এবং যোগ্য ব্যক্তি![৬] ব্রিটিশ শাসকরা এদেশের প্রজাদের কখনও কোনও ক্ষতি করেনি, বরং তারা এদেশের প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী — আর স্বভাবতই এ হেন ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন তিনি।[৭] তাঁর 'আনন্দমঠ'-এ তিনি তো এই তথ্যই প্রচার করেছেন যে 'বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু' হওয়ায় 'ইংরেজকে রাজা করিব।' ইংরেজ বাংলাদেশকে 'অরাজকতার' হাত থেকে 'উদ্ধার' করেছে, একথা প্রচার করে তিনি এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ভারতের 'জাতীয়তাবাদের জনক' বঙ্কিমচন্দ্র কোনরকম রাখঢাক না করেই সরাসরি বলেছেন :

> আমরা পরাধীন জাতি, অনেক কাল পরাধীন থাকিব, সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।[৮]

তিনি তো আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে লিখেছেন :

> ...ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না।[৯]

স্বভাবতই এহেন বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেস গঠন সম্পর্কে উৎসাহী হওয়াটাই ছিল সঙ্গত। অথচ তিনি এ ব্যাপারে নিস্পৃহতার ব্যূহ ভেদ করে বাইরে আসতে চাননি। জনৈক লেখক খুব ক্ষোভের সঙ্গেই লিখেছেন যে, যখন তাঁরই সমসাময়িকদের মধ্যে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতি জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে জেলে যাচ্ছেন, সে সময়ও বঙ্কিমচন্দ্র 'জাতীয় কংগ্রেস এখনও জনগণের সম্পত্তি হয়নি' বলে নীরব, নিস্পৃহ থেকেছেন।[১০] এর কারণ কী?

বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অব্যাহতকরণের পক্ষপাতী ছিলেন বলে এদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী

লড়াই-আন্দোলনকে কখনও সুনজরে দেখতেন না। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌতে 'ব্রিটিশ রেসিডেন্সি' বিদ্রোহীদের দ্বারা দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকার পর যখন স্যর হেনরি লরেন্সের প্রকৌশলে আবার তা মুক্ত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র স্যর হেনরি লরেন্সকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[১১] বঙ্কিমের এই মানসিকতা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের বিদ্রোহীদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে বুঝতে সাহায্য করে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস গঠিত হলেও এই কংগ্রেস যে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ার নিয়মতান্ত্রিক-রাজনীতিতে অটল থাকবে, এ বিষয়ে প্রচণ্ড ধীশক্তিসম্পন্ন বঙ্কিমের সন্দেহ থেকে গিয়েছিল। একটা জাতীয় প্ল্যাটফর্মের ভেতর মতদ্বৈধতার সংঘর্ষ যে অনিবার্য এবং তা যে শেষপর্যন্ত অক্টেভিয়ান হিউমের পরিকল্পিত ছকের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে না সে বিষয়টি তিনি মোটামুটি অনুমান করেছিলেন বলেই মনে হয়। ব্রিটিশ সরকারের একজন পদস্থ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র সমসময়ের রাজনীতির উত্তাপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, যদিও এই রাজনীতি তাঁর পছন্দের ছিল না।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় অক্টেভিয়ান হিউমের পরিকল্পনায় অনুমোদন দিলেও ওই বছরের মে মাসের শেষের দিক থেকে লর্ড ডাফরিন হিউম সম্পর্কে শীতল মনোভাব দেখাতে শুরু করেন এবং হিউমকে এড়িয়ে যেতে থাকেন। কেননা তিনি বুঝতে শুরু করেন যে, যে ছকে হিউম এগিয়েছেন সেই ছকে কিছু বড় রকমের গলতি রয়ে গিয়েছে। আর এর ফলে দেখা যায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে (অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার ঠিক পরেই) লর্ড ডাফরিন ভারতবর্ষে আইরিশ বিপ্লবের প্রেরণায় বিপ্লব সংঘটিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য 'বাঙালী বাবু' এবং মারাঠি ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখতে শুরু করেন।[১২]

ডাফরিনের মতো করে না-ভাবলেও এবং না-বুঝলেও, বঙ্কিমচন্দ্র এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই কংগ্রেসের আন্দোলন বা রাজনীতি পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলাবে এবং তা অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ স্বার্থ-সেবাপরায়ণ থাকবে না। রাজভক্ত বঙ্কিম, বাস্তবিক, এই কারণেই কংগ্রেসে যোগ দেওয়া দূরে থাক; কংগ্রেস সম্পর্কে তেমন কোনও উৎসাহ দেখাননি। এটা একটা কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজনীতি' করা পছন্দ করতেন না বলেই মনে হয়। যদিও এই রাজনীতি করার বিপরীতে 'রাজনীতি-না-করাটা'ও যে আরেক ধরনের রাজনীতি সে সম্পর্কে তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন তা ভাববার বিষয়। 'আন্দোলন', 'বক্তৃতা', 'সভা', 'রাজনীতি', 'স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন' প্রমুখ শব্দাবলি বঙ্কিমের কাছে বিদ্রূপের বিষয় বলে গণ্য হত।[১৩] স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের দাবির বিষয়কে তিনি বানর ও বাঙালিবাবুর কথোপকথনের মাধ্যমে বিদ্রূপ করেছেন।[১৪] এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

> আমাদের ইচ্ছা — পলিটিক্স হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স... কিন্তু... ভাই পলিটিক্সওয়ালারা, আমি... তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি,... পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।[১৫]

আন্দোলনকারীদের রাজনীতি বা পলিটিক্স সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা কেমন ছিল? তিনি মনে করতেন :

> স্বায়ত্বশাসন নির্ধারণ উপলক্ষে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে উল্লাস প্রকাশ করিতেছিলেন, বঙ্কিম তাহাতে সর্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারেন নাই। তিনি...বুঝিয়াছিলেন রাত্রি দিন ঘ্যান ঘ্যান প্যান্ প্যান্ করিয়া প্রভুগণকে জ্বালাতন করাই ইহাদের পলিটিকস।[১৬]

তাঁর 'প্রভুগণ' অর্থাৎ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে আন্দোলনের নামে বিরক্ত করা যে বঙ্কিম পছন্দ করতেন না তা এখানে পরিষ্কার। বঙ্কিমচন্দ্রের এক জীবনীকার জানিয়েছেন :

> আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শমাত্র ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি প্রাক্টিক্যাল পোলিটিকসের-এর ধার বড় ধারিতেন না।[১৭]

বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতি করা পছন্দ করতেন না; এর অর্থ এই যে ব্রিটিশ-বিরোধী কোনোরকম রাজনীতি বা আন্দোলন তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। লর্ড লিটন যখন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্যোগ নেন, তখন — বিস্ময়ের বিষয় এই যে — বঙ্কিমচন্দ্র সেই আইনকে সমর্থন জানিয়ে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। সমসময়ের অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্কিমের এই ভূমিকার প্রতিক্রিয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।[১৮]

স্বভাবতঃই বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেবেন না বা সমর্থনে সোচ্চার হবেন না, এটাই প্রত্যাশিত। দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশা যে তিনি উপলব্ধিতে আনতেন না এমনটি কখনও নয়। গরু বাঁচিয়ে দুধ খাওয়ার যে সংবচনটি এখন খুবই প্রচলিত তেমনই মনোভাবের পোষক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আগে সরকারের স্বার্থ তারপর জনগণের স্বার্থ। গরুই যদি না বাঁচল দুধ আসবে কোথা থেকে? সরকার বাঁচিয়ে রেখে জনস্বার্থ বিবেচনা — বন্ধু সরকারের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির যে মাহাত্ম্য গাথা আমরা এখনকার দিনে প্রচারিত হতে দেখি, এ যে নতুন কিছু নয় তা বোধহয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ভারতবাসীর 'দুঃখ ও অভাবে প্রকৃতরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন' এমন ইংরেজ আমাদের দেশে খুব কমই ছিলেন। এ ধরনের 'উদার প্রকৃতির' ইংরেজদের বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্ষণজন্মা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, আর এ হেন 'ক্ষণজন্মা' ইংরেজদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রেভেন্যু বোর্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মেম্বার রেনল্ডস্ সাহেব। এই রেনল্ডস্ সাহেবের প্রশংসা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন :

> এই লোকটি যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন কেহ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পায় নাই। এদেশ ছাড়িয়া গেলে পর অনেকে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছে এখন অনেকেই তাঁহার মহত্ব অনুভব করিতেছেন। আমাদের কনগ্রেসের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।[১৯]

আমাদের দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়াবলি ইংরেজ সরকার উপলব্ধিতে এনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেবেন এটাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা। দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম তাঁর নিকট অভিপ্রেত পথ বলে বিবেচিত হয়নি। আর একটি বিষয়, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'আমাদের কনগ্রেস' কথাটি বলেছেন, যার অর্থ আমাদের দেশের কংগ্রেস। কেননা বিজয়লাল দত্ত এই 'আমাদের কনগ্রেস' শব্দাবলি বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ থেকে শুনে উৎসাহবশে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেহেতু সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, এখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের 'বিশেষ হিত'সাধন করুন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য প্রত্যাশিতভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি হননি।[২০]

বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে তিনি 'কনগ্রেসের বিপক্ষে বা উহার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী' নন। তবু তাঁর পক্ষে — তাঁর চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পরবর্তীতেও — কংগ্রেসে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। 'কনগ্রেসের চেলা' বিজয়লাল দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার কারণ ব্যক্ত করার জন্য চেপে ধরলে বঙ্কিম বেশ সমস্যায় পড়ে যান। তিনি বারবার বলতে থাকেন, কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নেই একথা কখনও ঠিক নয়; কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যে 'অতি মহৎ' সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই ইত্যাদি। তবে যোগ না দেওয়ার কারণ কী? শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :

> যে প্রণালীতে উহার (কংগ্রেসের) কার্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আজ পর্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই —।[২১]

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতবর্ষে আপামর সাধারণ জনগণের কোন সম্পর্ক নেই, কংগ্রেস জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন — এমন কথা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> দেশের সাধারণ লোকদিগকে দূরে এবং অন্ধকারে রাখিয়া কতিপয় শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় অনুরূপ কার্য সাধিত হইলে কখনই উহার গৌরব বর্ধিত হইবে না এবং দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোক কখনই উহার আবশ্যকতা ও মহত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না। দেশের সাধারণ জনসমষ্টিকে মন্ত্রণা-গৃহ হইতে দূরে রাখিয়া বৎসরান্তে একবার ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনে প্রমত্ত হইলে তাহাতে দেশ জাগিবে না...[২২]

তাহলে দেশকে জাগানোর জন্য দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত ? বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য :

> যতদিন ধর্মনীতি ও সমাজনীতি রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলভিত্তি না হইবে, ততদিন কেবল নীরস রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। .... আমার বিবেচনায় রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলন সমস্ত দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত।[২৩]

ধর্মনীতি ও সমাজনীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতির 'মূলভিত্তি' করার কথা বলেছেন। বিষয়টি কেমন বোঝা মুশকিল। আনন্দমঠে তিনি যে শিক্ষা প্রচার করেছেন, তা যদি ধর্মনীতি ও সমাজনীতির মূলভিত্তিতে রাজনৈতিক অভিব্যক্তি হয় সেক্ষেত্রে বিষয়টি অনুমান করা যায় এবং বর্তমানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ক্রমোত্থান ও বিকাশের প্রেক্ষাপটে আশঙ্কাকে তীব্র করে তোলে।

যে কথা আগেও বলতে চেয়েছিলাম, রাজনীতি বা আন্দোলন বলতে বঙ্কিম ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগঠিত অভিযোজনা বিবেচনা করতেন এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় তিনি এর পরিপোষকতার পরিপন্থী ছিলেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসকে তিনি গণবিচ্ছিন্ন, জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নয় ইত্যাদি আখ্যাদানের মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্মভাবে এর বিরোধিতাই করেছেন। আর এ কথা বলতে গিয়ে তিনি যুক্তির তালগোল পাকিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থান নিয়েছেন। শেষে রাজনীতির মূলভিত্তি হিসেবে ধর্মনীতি ও সমাজনীতির কথা বলেছেন। আর এরপর যা বলেছেন তা তাঁর মনোভাব বুঝতে সহায়ক হয়। তিনি বলেছেন :

> আমি নানা চিন্তা ও নানা আন্দোলনের পর এক্ষণে ধর্মগ্রন্থের অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্ব প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছি — আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ধর্মচর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ব ও উন্নতি সাধিত হয় না, একমাত্র ধর্মানুরাগই জাতিমাত্রকে প্রভূত ধনশালী ও গৌরবান্বিত করিতে পারে।[২৪]

রাজনীতি নয়, কংগ্রেস নয় — এটাই ছিল তাঁর প্রকৃত মিশন। তিনি তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে প্রসঙ্গক্রমে এমন কিছু কথা বলেছেন যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার পক্ষে উপযোগী। এ রকম একটি বক্তব্যাংশ আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি :

> আমরা...সমাজ-সংস্করণকে একটা পৃথক জিনিস বলিয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতি-প্রিয়তাই ইহার কারণ। সমাজ-সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতি লাভ করা যায়। — বিশেষ সংস্করণ-পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরনের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুগ তার বড় ভাল লাগে। সমাজ-সংস্করণ আর কিছুই না হউক, একটা হুজুগ বটে। হুজুগ বড়ো আমোদের জিনিস। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজ-সংস্কার কিসের জোরে হইবে? রাজনৈতিক উন্নতির মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও।[২৫]

ধর্মের উন্নতিকেই যিনি রাজনৈতিক উন্নতির মূল বলে চিহ্নিত করে ধর্মের উন্নতিতে মন দেওয়ার পরামর্শ দেন, তিনি যে কেন আন্দোলন-বিমুখ ও কংগ্রেস সম্পর্কে উৎসাহহীন তা আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। 'উচ্চপদস্থ সরকারী কাজ, ব্যক্তিগত জীবনে অভিজাত চালচলন এবং সামাজিক পরিবেশজনিত দূরত্ব'[২৬] রক্ষাকারী বঙ্কিমচন্দ্র যে আন্দোলনের উত্তাপ বাঁচিয়ে চলবেন এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে সি. ই. বাকল্যান্ড লিখেছেন :

> ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) সাব অর্ডিনেট একজিকিউটিভ সার্ভিসের প্রথম গ্রেডে (বর্তমানে অস্থায়ী) উন্নীত হন। এছাড়া কিছুকাল তিনি বাংলার সরকারের সহকারী সচিবের দায়িত্বও সামলেছেন। তাঁর কাজ যথেষ্টই প্রশংসাজনক...এমনকি তিনি রাজশাহি এবং বর্ধমান ডিভিশানের কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবেও তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৭]

তাঁর এইসব সন্তোষজনক কাজের জন্য 'রাজসরকারে' বঙ্কিমচন্দ্র 'সবিশেষ সুখ্যাতি'র অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি 'যথাকালে পেনসন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন।'[২৮] আর তাঁর কাজে সন্তুষ্ট ব্রিটিশ সরকার তাঁর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরের বছরই (অর্থাৎ ১৮৯২ সালে) 'রায় বাহাদুর' এবং মৃত্যুর আগেই ১৮৯৪ সালে সি.আই.ই অর্থাৎ কম্পেনিঅন অব ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।[২৯]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যঙ্গরচনার মধ্যেও রাজভক্তি ও রাজভক্তির জন্য পুরস্কারের কথা বলেছেন, যা নিছক ব্যঙ্গ বলে মেনে নিতে দ্বিধা থেকে যায়। তিনি তাঁর 'ইংরাজস্তোত্র'-এ লিখেছেন :

> হে সর্ব্বদ (ইংরাজ)! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশ দাও... আমাকে রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।[৩০]

এখানে এ উক্তি যদি ব্যঙ্গও হয়, তবে পরবর্তীতে ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেম্বার হওয়া বা 'রায়বাহাদুর' উপাধি পাওয়ার বিষয়গুলিকে তিনি কীভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন তা পরিষ্কার নয়। খেতাব গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁর কোন আপত্তির তথ্য আমাদের জানা নেই। লর্ড রিপন এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় এ দেশের বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্মিলিত বিলাপের সুর শোনা গিয়েছিল। রিপন চলে যান ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'প্রচার' পত্রিকায় এ সময় প্রসঙ্গত লেখেন :

> রাজভক্তি বড় বাঞ্ছনীয়। রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ।...এলিজাবেথের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি ইংলণ্ডের উন্নতির একটি কারণ।[৩১]

এই লেখায় এইভাবে রাজভক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি বঙ্কিম খানিকটা আশঙ্কাগ্রস্তও হয়ে পড়েছিলেন। রিপনের উদার মনোভাবের দরুন 'সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে এই প্রায় মধ্যবিত্ত/লোকের হাতে' গিয়েছিল। এ তথ্য সামনে রেখে সমসময়ে 'ইংরেজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈরিতা' বৃদ্ধির প্রসঙ্গে তিনি মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে 'ধীরে ধীরে সুপথে' চলার পরামর্শ রেখেছিলেন। বিষয়টি মনোযোগের দাবি রাখে। ১৮৮৪ সালের শেষে বঙ্কিম একথা বলছেন। ১৮৮৫-র শেষে কংগ্রেস-এর জন্ম হয়। কংগ্রেসের জন্মের আগেই বঙ্কিমের এই সতর্কবাণীর সঙ্গে তাঁর কংগ্রেসে যোগ না-দেওয়ার ও কংগ্রেস সম্পর্কে অনুৎসাহী থাকার মধ্যে যোগসূত্রটি সম্ভবতঃ দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

---

[১] ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। বুক স্ট্যাণ্ড। কলকাতা। ১৩৫২ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ-৭৬

[২] ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : প্রাগুক্ত। পৃ-৮৬

[৩] এই অভিনন্দন ও প্রত্যভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলা হয়েছিল : Three cheers for Mr. Hume– the father of the Congress এবং Three cheers for Her Majesty the Queen Empress. — দ্রঃ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : প্রাগুক্ত। পৃ-৯১

[৪] সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ডি.এন.বি.এ. ব্রাদার্স। কলকাতা। ১৯৭২ সংস্করণ। পৃ-৩১২ এপ্রসঙ্গে স্মরণ থাকতে পারে যে ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ কর্মচারী হিউম কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজসরকারের প্রশাসনের গাফিলতির সমালোচনা করে এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নাতীত করার সুচতুর প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি আসলে ছিলেন :

> …a member of the Imperial Civil Service (Later the Indian Civil Service), a political reformer, collector of Madurai & administrator southern Bombay harbour ports. He was one of the founders of the Indian National Congress.…As an administrator of Etawah, he saw the Indian Rebellion of 1857 as a result of misgovernance and made great efforts to improve the lives of the common people. The district of Etawah was among the first to be returned to normality and over the next few years Hume's reforms led to the district being considered a model of development. Hume rose in the ranks of the Indian Civil Service and, in 1871 to the position of secretary to the Department of Revenue, Agriculture, and Commerce under Governor-General Lord Mayo…. After retiring from the civil services and towards the end of Lord Lytton's rule, Hume observed that the people of India had a sense of hopelessness and wanted to do something, noting "a sudden violent outbreak of sporadic crime, murders of obnoxious persons, robbery of bankers and looting of bazaars, acts really of lawlessness which by a due coalescence of forces might any day develop into a National Revolt." Concerning the British government, he stated that a studied and invariable disregard, if not actually contempt for the opinions and feelings of our subjects, is at the present day the leading characteristic of our government in every branch of the administration. The idea of the Indian Union took shape and Hume initially had some support from Lord Dufferin for this, although the latter wished to have no official link to it. It has been suggested that the idea was originally conceived in a private meeting of seventeen men after a Theosophical Convention held at Madras in December 1884. Hume took the initiative, and it was in March 1885, when the first notice was issued convening the first Indian National Union to meet at Poona the following December.
>
> — https-//simple.wikipedia.org/

[৫] দ্রষ্টব্য, বঙ্গদর্শন, এপ্রিল ১৮৭২

[৬] দ্রষ্টব্য, বঙ্গদর্শন, এপ্রিল ১৮৭৫

[৭] দ্রষ্টব্য, বঙ্গদর্শন, ডিসেম্বর ১৮৭২

[৮] দ্র: 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধ (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড)। বঙ্কিম রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা ১৪০১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ-২১৪

[৯] দ্রঃ 'ভারত কলঙ্ক/ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' শীর্ষক প্রবন্ধ। বঙ্কিম রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ-২০৭

[১০] Asish Majumder- Bankimchandra and the contemporary politics. Frontier, February 19, 1994

[১১] Asish Majumder- ibid

> আর এই মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরে বঙ্কিমচন্দ্র যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হিসেবে তাঁর নিয়োগপত্র পান তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ১৮৫৮-র ৬ অগাস্ট আদেশ অনুযায়ী। এই সরকারি অর্ডার বেরোবার পাঁচ দিনের মাথায় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ অগাস্ট-এর ক্যালকাটা গেজেট-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।
>
> — শনিবারের চিঠি, বঙ্কিম সংখ্যা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ। পৃ-৩৫

[১২] Bipan Chandra : India's Struggle for Independence 1857-1947. Penguin Books. Calcutta. 1989 Edn. p-70

[১৩] Asish Majumder : Ibid.

[১৪] দ্র: বঙ্কিম রচনাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ-৩৯

[১৫] দ্র: বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ ফাল্গুন। বঙ্কিম রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ-৮৩।

[১৬] অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত : বঙ্কিমচন্দ্র (ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত)। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। ১৯৭৫ সংস্করণ। পৃ-২২৮

[১৭] অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত : প্রাগুক্ত। পৃ-২২৭

[১৮] Amrita Bazar Patrika, October 16, 1873

এই পত্রিকায় লেখা হয়েছিল :

> … according to his (বঙ্কিমচন্দ্র) opinion, 'much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press, …We are taken by surprise at the remrks of an educated native like Bunkim Babu, who holds no inconsiderable position in our society. Cetainly in a free country such remarks from a person of Bunkim Babu's Position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country.

[১৯] বিজয়লাল দত্ত : বঙ্কিমচন্দ্র (দ্রঃ সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র'। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৯৬৮ সংস্করণ। পৃ-৪১)

[২০] বিজয়লাল দত্ত : বঙ্কিমচন্দ্র। (সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র'। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কলকাতা। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ। পৃ-৩৬-৩৭

[২১] বিজয়লাল দত্ত : প্রাগুক্ত। পৃ-৩৭

[২২] প্রাগুক্ত । পৃ ৩৭

[২৩] প্রাগুক্ত।

[২৪] বিজয়লাল দত্ত : প্রাগুক্ত। পৃ-৪২

[২৫] বঙ্কিম পরিচয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৮ সংস্করণ। পৃ ৯৫-৯৬

[২৬] সোমেন্দ্রনাথ বসু : ভূমিকা/কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাগুক্ত। পৃ-১২

[২৭] বাকল্যান্ডের মূল বক্তব্যটি ছিল :

> By 1885 he had risen to the first grade in the Sub-ordinate Executive (now the provincial) Service, and for sometime acted as an Assistant Secretary to the Government of Bengal. He rendered good service... and also acted as personal Assistant to the Commissioners of the Rajshahi and Burdwan Divisions.
>
> — উদ্ধৃত, সজনীকান্ত দাস : বঙ্কিম জীবনী। শনিবারের চিঠি, বঙ্কিম সংখ্যা। আষাঢ় ১৩৪৫। পুনর্মুদ্রিত, শনিবারের চিঠি, বঙ্কিম সংখ্যা। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫। পৃ ৩১-৩২

[২৮] হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক'। বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো মেসিন-প্রেসে শ্রী নুটবিহারী রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কলকাতা। ১৩১১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ-৪১৭

[২৯] বঙ্কিম পরিচয়। প্রাগুক্ত। পৃ- পরিশিষ্ট, থ, দ

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত। পৃ-৪১৭

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ-২৩

[৩০] বঙ্কিম রচনাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ-৯

[৩১] দ্রঃ প্রচার। পৌষ ১২৯১

[৩২] প্রাগুক্ত ।

অশোক চট্টোপাধ্যায় : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও 'সাংস্কৃতিক সমসময়' পত্রিকার সম্পাদক।